দৈনিক জনকণ্ঠ

২২

তারিখ 11 AUG 199... পৃঃ ... কলাম ...

পরীক্ষায় গণব্যর্থতার বাৎসরিক মহোৎসব

ওবায়েদ উল হক

তে সরা আগস্টে চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। মেধা তালিকায় শীর্ষস্থানের অধিকারী ছাত্রছাত্রীদের (কারো কারো পিতা-মাতারও) হাস্যোজ্জ্বল ছবি ছাপা হয়েছে ঐদিনের সংবাদপত্রের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায়, ভেতরের পাতায়ও আছে অনেকের ছবি ও খবর। —

পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তাদের আনন্দ প্রকাশ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রতিদিন দুঃসংবাদে ভরা সংবাদপত্রের পাতায় এ কারণে আলোর ছটা দেখে আমরাও বিরল আনন্দ অনুভব করেছি। তাদের গৌরবে গর্বিত হয়েছি। তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। প্রার্থনা করি যেন তারা সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তাদের উচ্চ শিক্ষাজীবন আরো কৃতিত্বের সঙ্গে সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু পরের দিন ৪ আগস্টের সংবাদপত্রের শেষ পাতায় একটি খবর পড়ে মনে তীব্র ব্যথা অনুভব করেছি। অর্ধ কলামের একটি শিরোনাম এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য তিন ছাত্রছাত্রীর আত্মহত্যা। খুলনার এক ছাত্র ও এক ছাত্রী এবং কিশোরগঞ্জের এক ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে মনের দুঃখে কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করেছে। এবং ৭ আগস্টের জনকণ্ঠে দেখা গেল বগুড়ায় আরও তিনজন অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। হরিষে বিষাদ। কবির কথায় এ যেন কাঁটা নিকুঞ্জে সুখের ছবি আঁকার মতো। অথচ অকৃতকার্যরাই যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ তখন তাদের এমন দুর্বলতার কারণ কি? অধিকাংশ পরীক্ষার্থী প্রতিবছর ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে বেড়াবে কেন, এই প্রশ্ন করাই ত সঙ্গত হবে। এতগুলো ছাত্রছাত্রী দশম শ্রেণী পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয় কি করে? প্রিটেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষায় পাস হয়ে মোটা অঙ্কের ফিস জমা দিয়ে ফাইনাল পরীক্ষায় বসার যোগ্যতা অর্জন করে কিভাবে? এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যদি এতই মস্তিষ্কহীন, বুদ্ধিহীন, ধীহীন হয়, তবে এই জাতি এতদিন টিকে আছে কিভাবে তা ভেবেই বিস্মিত হতে হয়।

আগে সমগ্র অবিভক্ত বাংলায় এই পরীক্ষা নেয়া হতো এক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায়। এখন দ্বিখণ্ডিত বাংলায় পাঁচ পাঁচটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় এই এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা কতগুণ উন্নতি হয়েছে এই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাপনায়? এসব কি পাস-ফেল-এর পরীক্ষা, না বাঁচা-মরার অগ্নিপরীক্ষা? অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের আত্মহননের মধ্যেই যদি সকল সমস্যার সমাধান নিহিত থাকে, তবে আর পরীক্ষার দরকার কি? পরীক্ষা না দিলে অন্ততঃ কীটনাশক পানে প্রাণনাশের সম্ভাবনা এড়ানো সম্ভব। তা'হলে এই বার্ষিক ব্যর্থতার বিপুল আয়োজন করতে অপরিসীম আর্থিক অপচয় থেকে এই সম্পদহীন অন্যের সাহায্য নির্ভর দেশ ও জাতিও রক্ষা পেতে পারে।

সেই কবে থেকে এ রকম বাৎসরিক ট্র্যাজিক ঘটনা ঘটানো হচ্ছে বেশ সাড়ম্বরেই। এসব পরীক্ষার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাফল্যের পূর্ণিমা এবং ব্যর্থতার অমাবস্যা পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায়। বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এই বিরস নাটকের বিষাদক্লিষ্ট পাত্র-পাত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে। এক সিনিক রসিকতা করে বলেছে; এই বিয়োগান্তক নাটকের অভিনয় বন্ধ হলে ফেল করার অধিকার থেকেও এরা বঞ্চিত হবে। দেখা যাচ্ছে, চারদিকে অসাফল্যের অসংখ্য খুঁটি দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও 'ফেইলিওর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস' কথাটা এখন এ দেশে প্রচলিত নয়। অসাফল্যের খুঁটির অরণ্যে সাফল্য হারিয়ে ফেলছি।

ইমার্সন বলেছেন,—"The things taught in schools and colleges are not an education, but the means of education." শিক্ষার উপকরণ নিয়ে দু'টি কথা বলতে হয়। আমার সামনে দু'টি অবশ্য পাঠ্যপুস্তক আছে। একটি ন্যাশনাল কারিকুলাম এ্যান্ড টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ইংলিশ ফর টুডে (ফর ক্লাস সিক্স), অপরটি জনৈক অধ্যাপক রচিত ব্যাকরণ ও রচনা। ইংলিশ ফর টুডে বইয়ে ১ থেকে ৭২ পৃষ্ঠার পর ৮৯ থেকে ১৪২ পৃষ্ঠা রয়েছে। মাঝখানে ৭৩ থেকে ৮৮ এই ষোল পৃষ্ঠা নেই। বোধহয় বাঁধাইয়ের সময়ে এই পৃষ্ঠাগুলো বাদ পড়ে গেছে। অন্য বইটিতে বর্ষাকাল সম্বন্ধে লেখা হয়েছে ঃ "তখন আকাশে দেখা যায় কাল মেঘের আনাগোনা। সারাদিন বৃষ্টি আর বৃষ্টি।" এভাবেই পড়ছিল মেয়েটি। ভুল পড়ছে বলায় তার উত্তর ঃ অধ্যাপকের লেখা। ভুল হতে পারে না। এটা ছাপার ভুল। অধ্যাপকের নয়, মুদ্রণ প্রমাদ। অতশত যে বোঝে না। একটিতে দুই ফর্মার ফাঁক। অন্যটিতে ভুল বানানের ফাঁদ। উপকরণগত ফাঁক ও ফাঁদে পড়ে কোমলমতি ছেলেমেয়েদের মতিভ্রম ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। এসব ত্রুটিপূর্ণ বইপত্র পুরো দামে কিনতে হয় এবং ভুলের ফাঁদে না পড়ার কসরৎ করতে হয় ছেলেমেয়েদের। কিন্তু পরীক্ষায় ব্যর্থতার ফাঁদ এড়ানো অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না।

এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান সিস্টেমে শুধু স্কুলের সীমিত সংখ্যক শিক্ষক বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দানের কাজ সুসম্পন্ন করতে পারছেন না। সে জন্য কোচিং সিস্টেমের উদ্ভাবন। এই কোচিং নেটওয়ার্ক আরো সম্প্রসারিত হলে হয়ত ফেলের হার কমানো যেতো। কিন্তু আমাদের আদি সমস্যা দারিদ্র্য এ পথেও কাঁটা হয়ে আছে। স্কুল এবং কোচিং এই দুই সিস্টেমের ব্যয় নির্বাহ করার সামর্থ্য অধিকাংশেরই নেই। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় না, এমন সংসারের সংখ্যা কত? স্কুলের চাহিদা মেটাতেই তাদের নাভিশ্বাস ওঠে। কোচিং-এর বিলাসিতা তো দিবা স্বপ্ন।

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় গণব্যর্থতা একমাত্র সমস্যা নয়। পুরনো সিলেবাস অনুযায়ী আড়াই লাখ ছাত্রছাত্রী এবার এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শেষ সুযোগ পেয়েছিল। এদের মধ্যে দেড় লাখ কৃতকার্য হয়েছে। বাকি এক লক্ষ অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন নিয়েই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কারণ শিক্ষা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরনো সিলেবাসের অধীনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শেষ সুযোগ দেয়া হয়েছিল এবার। অর্থাৎ এবারের অকৃতকার্য এক লক্ষ ছাত্রছাত্রী আগামীতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ফলে এই এক লাখ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন একেবারেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অন্য যে একটি মাত্র পথ তাদের জন্য খোলা আছে তা হচ্ছে আবার নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে নতুন সিলেবাসের মাধ্যমে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া। পথটি খোলা থাকলেও এ পথের পথিক থাকবে কিনা সন্দেহ। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় কোন ফেল করা ছাত্রছাত্রী আবার নবম শ্রেণী থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যাবে এমন চিন্তা করা অবাস্তব। বর্তমান নিয়মে এক ছাত্র সর্বমোট তিন বার এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এই নিয়ম কিছুমাত্র শিথিল না করলে এই এক লাখ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন হয়ত এখানেই শেষ হয়ে যাবে। এ নিয়ে তাদের অভিভাবকেরা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ মহলে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে জেনে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া গেল।

মেধার স্তরভেদ অবশ্যই আছে। কেউ চূড়ায়, কেউ মধ্যদেশে, কেউ পাদদেশে। যদিও আরো অনেকের মতো বুয়েটের উপাচার্য সেদিন বলেছেন, মেধা তালিকা নির্মাণের প্রচলিত পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত নয়। তালিকা যাই হোক, কেউ সম্পূর্ণরূপে মেধাহীন নয়। এমনকি, জনৈক প্রতিবন্ধী বলেছে, Don't call me handicapped. Call me handicapable. আসলে যে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অকৃতকার্যরাই সর্বদা সংখ্যাধিক থাকে সে শিক্ষা ব্যবস্থার উপযুক্ততা সম্পর্কে দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশ অবশ্যই আছে। নির্দ্বিধায় বলা যায়, এটা শুধু পরীক্ষার্থীদের ব্যর্থতা নয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকেও এ ব্যর্থতার ভাগী নিতে হবে। এবং এ ব্যাপারে এক ধরনের অসুস্থ ও অসংস্কৃত রাজনীতির দায়িত্ব আছে কিনা তাও গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয়। মোদ্দা কথা, লক্ষ লক্ষ অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী সকলেই মগজবিহীন গোবরগণেশ কিনা কোন একটা উন্নত পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

পরিশেষে একটি সত্য ঘটনা বলি। রাজেন মুখার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় অপ্রত্যাশিতভাবে অকৃতকার্য হয়েও পরে এক বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট স্থাপন করেন। এ কথা স্মরণ করে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একদা বলেছিলেন—'ভাগ্যিস রাজেন ফেল করেছিল।' তাঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল—রাজেন পাস করলে হয়ত খুব বড় চাকুরে হতেন। কিন্তু এখন তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার চাকরি করেন। এবং তিনি দেশের গৌরব।

কথাটা ব্যর্থতাকে সমর্থন করার জন্য বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে প্রতিবছর বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর ব্যর্থতাকে সার্থকতায় রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার তাগিদে।